স্বাধীনতা যাঁর চেতনায় ছিল খোলা জানালার প্রতিভাস:
শঙ্কর রায়

প্রিয় বন্ধু ও সতীর্থ কবি লুই ম্যাকনীস-এর অকালপ্রয়াণ-এ উইস্টান হিউ অডেন লিখেছিলেন প্রয়াণ কোনো মানুষের জীবৎকালের মূল্যায়নের অবকাশ নয়। এঁরা ছিলেন ১৯৩০ দশকের অক্সব্রীজ কবি-গোষ্ঠীভুক্ত, মননে-চিন্তনে বামপন্থী। স্টিফেন স্পেন্ডার, সেসিল ডে-লুইস সেই উজ্বল জ্যোতিষ্কদের অন্যতম-বলা হত অডেন গ্রুপ। অডেনের তখনকার শোকার্ত মানসিকতায় (ম্যাকনীসের ৫৬ বছর পূর্ণ হয়নি) ঐ উক্তি অস্বাভাবিক ছিলনা। শিবনারায়ন রায়ের ৮৮ বছরে জীবনাবসানে (গত ২৬ ফেব্রুয়ারি) বরং অকপটে মূল্যায়ন কাম্য, কারণ তিনি সবকিছু খোলাখুলি ব্যক্ত করতেন, অন্যদেরও তাঁর সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট অভিমত শুনতে চাইতেন। সমালোচনা করার সময় কাউকে তিনি রেয়াং করেননি, তাঁর পথপ্রদর্শক মানবেন্দ্রনাথ রায়কেও নয়। ইকনমিক এন্ড পোলিটিক্যাল উইকলিতে রাভেলা সোমাইয়া লিখেছেন :

‘He was well known for his commitment to human values, courage of conviction, |independent thinking, originality and simplicity. He wrote and fought for building a “new human civilisation” and for the development of a “new human culture’

মৌমাছিতন্ত্রের ধারণা শিবনারায়ন আহরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। ‘লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারছেনা।এতে করে তাদের চাক নিখুঁত মতো তৈরি হচছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরন এই চিরাভ্যাসের গন্ডীর মধ্যে বন্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানাদিকে মেলে দিতে পারছেনা‘-রচনাবলী-১৪ খন্ড, প ৩২০ । কবির চিন্তার সঙ্গে সাযুজ্য পেয়েছিলেন আরুইন পানোফস্কির ।

মৌমাছিতন্ত্র স্তালিন যুগে কিছুটা কদর্য রূপ নিয়েছিল। তা নাহলে বের্টোল্ট ব্রেখট লিখতেন না:
‘ওআন ম্যান হ্যায টু আইয।
দি পার্টি হ্যায আ তাইজ্যানড আইয।
দি পাটি ওভারলুক্স সেভেন স্টেটর্স ।
ওআন ম্যান সিয ওআন সিটি।
ওআন ম্যান হ্যায হিয আওয়ার
বাট দি পার্টি হ্যায মেনি আওয়ারস।
ওআন ম্যান ক্যান ডাই
বাট দি পার্টি ক্যানট বি কিল্ড‘।

শিবনারায়ন তাঁর ‘মৌমাছিতন্ত্র‘ এ কবিতাংশ উল্লেখ করেছিলেন। কমিউনিস্ট তাত্বিকরা নীরব ছিলেন, নেতারা কি বলতেন আজও জানিনা।হয়তো শুধালে বলতেন, তখন কৌশলগত কারণে প্রয়োজন ছিল, যেমন নাকি দরকার ছিল ত্রৎস্কি,বুখারিন,গিনোভিয়েভ,কামেনেভ,বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখার্জি (আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বনধু- ‘মেইনস্ট্রিম‘ সাপ্তাহিক-এ তাঁর অনবদ্য স্মরণকথা মনে পড়ে) ইত্যাদির নির্মম হত্যা এবং কয়েক হাজার পার্টিসদস্যের - সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সদস্যসহ - নিখোঁজ হওয়াও দরকার ছিল!! কমিন্টার্ণ গবেষক আমার বন্ধু অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্তের প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘কমিন্টার্ণ এন্ড দি ডেস্টিনি অফ কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া - ১৯১৯-১৯৪৩‘ এই ধারণা যে স্তালিনের অমার্জনীয় অপরাধ চাপা দেবার অপচেস্টা এবং ক্ষমতালোভের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়, তা প্রতিপন্ন করেছে। শোভন ১৯৮০ দশকে গর্বাচেভ-জমানার একেবারে শেষদিকে কমিন্টার্ণ মজাফেজখানা উন্মুক্ত করার পরে ছ‘মাস সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ মহাফেজখানায় কাজ করে বইটি লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে বলি সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় নেত্রিত্ব চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বীর সৈনিক ও কমিউনিস্ট পার্টি গবেষক সুবোধ রায়-কে ঐমহাফেজখানায় পাঠিয়ে ছিলেন। কয়েকশ‘ ফাইল ও দলিল ফোটোকপি ও ফোটোস্ট্যাট করে এনেছিলেন। কিন্তু ঐ সব দলিল বাক্সবন্দী রয়েছে এক দশকেরও বেশী। শোভন দেখে এসেছিলেন তাঁর চিহ্ন। কারণ মহাফেজখানায় যে যে ফাইল যিনি দেখেছেন, তাঁর নাম, দোভাষীর নাম লেখা থাকে। জীবনাবসানের বছরখানেক আগে শোভন তাঁর সঙগে দেখা করে শুধিয়েছিলেন। সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় নেত্রিত্বের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, ‘আমি পার্টির অনুগত সৈনিক।আমি সব দিয়ে দিয়েছি। আমার কর্তব্য করেছি‘। অন্তর্বেদনা অন্তরে রেখে দেওয়া ছাড়া

আর কি করার ছিল। শোভন দি টেলিগ্রাফ দৈনিকে সুবোধবাবুর প্রয়াণের পরে ঐ সাক্ষাৎকারের কথা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন।

কয়েক বছর আগে তিনি মার্কসীয় ও ফ্রয়েডীয় চিন্তনের প্রয়োজনীয়তা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। 'একুশ শতকের ভূমিকা হিসাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেসটো যেমন প্রাসংগিকতা হারায়নি তেমনি হারায়নি ফ্রয়েডের দ্য ফিউচার অব অ্যান ইল্যুশ্যন' (জারনাল থেকে -*বন্য গোলাপের সুগন্ধ: তসলিমা নাসরিনের দ্বিখণ্ডিত*,জিজঞাসা,জুলাই-ডিসেম্বর,২০০৩) । এই বাক্যাংশ উল্লেখ করছি এ কারণে যে মতাদর্শগতভাবে তাঁর সতীর্থ অম্লান দত্ত তাঁর স্মরনে লিখেছেন যে মানবেনদ্রনাথ ও তিনি মার্কসীয় দর্শন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন (অম্লান দত্ত:জীবনব্যাপী একটি সাধনা- **দেশ** ১৭ এপ্রিল,২০০৮)। এঁরা কেউই মাকর্স-বিরোধী হয়ে যান নি, সমালোচনাত্মক মনন দিয়ে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবার্গও (যাঁকে লেনিন বলেছিলেন 'বিপ্লবের ঈগল পাখি, ফ্রান্জ মেরিঙ যাঁর সমপর্কে বলেছিলেন, মাকর্স ও এনগেলসের পরেই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা) পুঁজিভবন প্রশ্নে 'ক্যাপিটাল'-এ মাকর্সের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিকল্প মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাহলে কি বলতে হবে রোজাও মাকর্সবাদ-বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন?

তথাচ তিনি যখন মৌমাছিতন্ত্রে লিখেছিলেন,'যুদ্ধোত্তর প্রিথিবীতে ফ্যাসিজম-এর চাইতে এটিরই (মৌমাছিতন্ত্রের) প্রতিপত্তি বেশী', তখন তাঁর ইতিহাস-চেতনার কিছুটা সমালোচনা দায়বদ্ধতা বর্তায় বৈকি। স্তালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সেখানকার জনগণ ফ্যাসিবাদী জর্মনীর চেয়েও দুদশার্গ্রস্থ ও করুণতর জীবনযাপন করতেন, এ ধারণা তথ্যভিত্তিকও নয়,সত্যভিত্তিকও নয়। মৌমাছিতন্ত্রের নিগড়ে মানসিক যন্ত্রণা দুই ব্যবস্থাতেই কম-বেশী ছিল, কিন্তু আর্থিক শোষণ স্তালিন-আমলেও মোটেই তীব্র ছিলনা। বরং ১৯২৯-৩০ নাগাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অর্থনৈতিক সংকটে থরথর, সোভিয়েত ইউনয়নে তখন কেউ বেকার ছিলনা।

কিন্তু শিবনারায়ন ঠিকই বলেছিলেন, ফ্যাসিজমের প্রত্যয় 'জাতির সমষ্টিগত সত্তার বিলোপে ব্যক্তির মোক্ষ... রুসোর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আমাদের এই মৌমাছিতন্ত্রে দীক্ষা দিলেন; তারপর বিবেকানন্দ,তিলক,অরবিন্দ প্রমুখ মহরষিদের দিব্যজঞানেরসমরথনে সে-মন্ত্র ক্রমে ভারতীয় শিক্ষিত মনে তার প্রবল মোহপাশ বিস্তার করল। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর আবিরভাব ঘটল। তিনি বিচার বুদ্ধিকে নাকচ করে দৈব নিরদেশকেই সামষ্টিক ব্যবহারের নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।... মহাত্মা নীতিবোধের নামে বিজঞানবুদ্ধির গোড়াঘেঁষে কোপ লাগালেন।'

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবোধ,মানবতাবাদ এবং ব্যক্তিসত্তার মেলবন্ধনের পক্ষে আজীবন কলম ধরেছেন,যা শিবনারায়নকে আক্রিষ্ট করেছিলো। এ জন্যে তিনি যখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে যোগদানের পর অম্লান দত্ত অনুরোধ করলেন রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষের ভারগ্রহণ করতে, সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত করলেন।যাঁরা এর মধ্যে স্বজনপোষণ আবিষ্কার করেছিলেন (শিবনারায়ন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪০-এর দশকে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং রেজিনা গুহ সরণপদক পেয়েছিলেন, এই তথ্যটি না জেনে কুৎসায় মেতেছিলেন), তাঁদের অনেকে (যাঁদের বিশ্বভারতীর সঙগে যোগাযোগ আছে) পরে কবুল করেছিলেন, অম্লানবাবু যোগ্য মানুষকে বেছেছিলেন।

প্রখর যুক্তিবাদী শিবনারায়ন মতাদর্শগত দিক থেকে যাঁদের বিরোধী ছিলেন, তাঁদের প্রতি কখখনো অশ্রদ্ধা-পোষণ করতেন না। এই দিকটা 'সাহিত্যচিন্তা'প্রবন্ধ সংগ্রহে বিশেষভাবে পরিষফুট। আমি এ ব্যাপারে একটি প্রবন্ধের উললেখ করব- 'লাটিম থেকে লাটাই:: বিশ্বপথিক কবি ও মনীষি অমিয় চক্রবর্তী' (চতুরঙ্গ - অগস্ট ১৯৯২)। মানবেনদ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের আগে ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐ কবি ও সাহিত্য-চিন্তক তাঁর মননগত বিকাশে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়ে ছিলেন সাহিত্য ক্ষেত্রে। দুজনের মনশ্চরিত্র-কাঠামোয় বৈপরীত্য ছিল। অমিয়বাবু পলেমিক্সে অনীহ ছিলেন, শিবনারায়য়ন পলেমিক্সে তুখোড়। কিন্তু জ্ঞান-চর্চায় তাঁদের সম্পর্ক ছিল একদিকে গুরু-শিষ্যের, অন্যদিকে অগ্রজ-অনুজ বন্ধুতার। অমিয়বাবুকে তিনি যেমন নিরমোহো বিচার করেছেন ঐ নিবন্ধে, তেমনি শ্রদ্ধাবনত স্মরণ করেছেন। যে গান্ধীজির প্রতি শিবনারায়নের তীব্র মতাদর্শগত বিরুদ্ধতা মৌমাছিতন্ত্রে, প্রায় চার দশক পরে লিখছেন - 'তিনি যে এ শতকের ইতিহাসের একজন প্রধান পুরুষ এবং অন্যায়ের বিরোধিতায় অহিংস আসহযোগ যে একটি গভীর সম্ভাবনাময় পদ্ধতি, তা নিয়ে আমার মনে সংশয় নেই: এবং জীবনের সর্বশেষ পর্বে গান্ধীর সত্যাগ্রহী একাকিতা এবং ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি আমার চেতনায় আলোড়ন তোলে'।

যদিও শিবনারায়ন রাজনৈতিক তাত্বিক হিশেবেই খ্যাত, তাঁর মৌলিক বিচরণক্ষেত্র ছিল সাহিত্য। অমিয় চক্রবর্তী নিয়ে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছিল। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঐ প্রবন্ধ অমিয় চক্রবতীর কাব্য-প্রতিমা নির্মাণ বিরল ও বিস্ময়কর। এক জায়গায় লিখছেন,‘ তিনি দেখতে পেলেন ‘ধ্যানের সিনেমাতে/মুদির দোকান, মাছি মাতে‘ (পুকুর)# ধুলোয়,মগজের গলিতে বিচিত্র দাগ,সচচ আসা যাওয়া, সবই অপূর্ণ‘। অমিয় চক্রবর্তী বাস্তবিকই দেশকালকে পেরিয়ে এসে মানুষকে দেখতে পেতেন একেবারে অন্যতর আঁখিতে। আফ্রিকায় ‘হঠাং মাটির ঘরে ছায়ারং মানুষের দেশে‘ পুলকিত হন, কলমে ফুটে ওঠে সানন্দ বিস্ময় - যেন তাঁর মা কোনো কুটীরে গড়েছেন সংসার। এই রকম সেলুলয়েড-সাংকেতিক আদল নির্মিত হত কবির টেলিগ্রাফিক ভাষায়। এই বিশ্লেষণের মৌলিকতা শিবনারায়নের অনায়াসসাধ্য ছিল।

যখন একশ্রেণীর বাম-পোশাকী ব্রামহণ্য-উন্নাসিক তসলিমার লেখাকে নিম্নমানের সাহিত্য বলে কুৎসায় নিয়োজিত, শিবনারায়ন লিখলেন- ‘খণ্ডএ খণ্ডএ প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীর, এবং বিশেষ করে ৩য় খণ্ডটির সবচাইতে বড় মূল্য ও আকর্ষণ এটির ভিতর দিয়ে আমরা জানতে পারি কীভাবে বহু বাধাবিপত্তি,আঘাত,অপমান ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত ঘরের একটি সাধারণ মেয়ে তাঁর আত্মশক্তি আবিষ্কার করেন, অপ্রতিম তসলিমা নাসরিন হয়ে ওঠেন।প্রথম দুটি খণ্ডএ যে ভূমিকা রচিত হয়েছিল তা পরিণতি পায়। **এই গ্রন্থের যেমন ঐতিহাসিক থেমনি সাহিত্যিক মূল্য প্রচুর** ‘ (মোটা হরফ সংজোজিত)।

গোড়াতেই বলেছি, শিবনারায়নকে খোলা চোখে দেখতে হবে, তাঁরই মতো। তিনি ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করেছিলেন (ইতিহারবিদ ও সমাজতাত্বিক রামচন্দ্র গুহ শিবনারায়নের অনুরাগী হয়েও আমাকে স্মরিয়ে দিয়েছেন শিবনারায়নের কোএস্ট বা এনকাউন্টার পত্রিকায় প্রবন্ধটি। এটি অবশ্যই নিন্দনীয়, বিশেষত মৌমাছিতন্ত্রের লেখকের পক্ষে। সোমাইয়া লিখেছেন যে রামমনোহর লোহিয়ার জাতপাত নিয়ে লেখাগুলি শিবনারায়নকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং সোমাইয়াকে শিবনারায়ন নাকি বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নাকি চিন্তার মিল ছিল। লোহিয়া আর এস এস নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রধান প্রচারক ছিলেন উত্তর প্রদেশ থেকে ১৯৬০ দশকের শেষদিকে লোকসভা উপনির্বাচনে এবং জিতিয়ে ছিলেন । লোহিয়াকেও আরেক উপ-নির্বাচনে লোকসভাতে জিততে সাহায্য করেছিলেন। ছদ্মসমাজতন্ত্রী লোহিয়া ছিলেন প্যাথলজিক্যাল মার্কর্সবাদ-বিরোধী। তাঁর সঙ্গে শিবনারায়নের চিন্তাগত মিল বেমানান, বিস্ময়কর। তিনি কোনো লেখায় লোহিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা থাকতে পারে। আমার অবশ্য জানা নেই।

যৌবনে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলাম, শিবনারায়নকে প্রায় প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবি এমন ধারণা আমাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে সংশয় ছিল খানিকটা। সে ধারণায় আঘাতের স্পর্শ পেলাম তিনি যখন একটি লেখায় কবুল করলেন যে ‘প্রবাসের জার্ণাল‘-এ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ভ্রান্ত মূল্যায়ন করেছিলেন এবং কবিকে বিশ্বের প্রথম সারির চিত্রকর হিশেবে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা তাঁকে চিনেছিলেন বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে। শিবনারায়ন সেদিন অম্লানবাবুর সংগে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠেছিলেন। *মুক্তান্বেষা*র প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক অজয় রায় যখন অনুরোধ করলেন শিবনারায়ন রায় নিয়ে লিখতে, দ্বিধায় ছিলাম। কারণ তাঁর বিষয়ে যারা সবচেয়ে কম পড়েছেন, আমি তাদের প্রথম সারিতে। কিন্তু যৌবনে তাঁকে না বুঝে অপছন্দ করতাম। প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ পেলাম। আমি দায়বদ্ধ।

===

শঙ্কর রায়, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ভাস্যকার। মুক্তমনায় নিয়মিত লিখে থাকেন। ইমেইল - sankarray62@rediffmail.com